দশম পরিচ্ছেদ

মেলা ও উৎসব

মানুষের সমবেত হওয়ার প্রয়াস থেকেই মেলার উদ্ভব। মেলা মানুষের সামাজিক বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম। লোকায়ত ও আধুনিক সঞ্চরণশীল আয়োজনের আর এক নাম মেলা।

প্রবহমান মানবজীবনের বৈচিত্র্য আনতে উৎসবের জুড়ি নেই। উপলক্ষ যা-ই হোক, উৎসব মানুষের প্রাণকে নতুন ভাবে স্পন্দিত করে। মেলা ও উৎসব কার্যত একে অপরের পরিপূরক। দুই-ই মানুষকে সংঘবদ্ধ করে। সংহতি দান করে। আর সর্বোপরি নির্ভেজাল আনন্দের জোগান দেয়। টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে মূলত তিন ধরনের মেলা ও উৎসবের প্রাধান্য: ক) ধর্মীয়, খ) সামাজিক ও গ) রাষ্ট্রীয় বা জাতীয়। বাণিজ্যিক মেলা-উৎসবের তেমন চল নেই।

ক) ধর্মীয় মেলা ও উৎসব :

দুর্গাপুজো, কালীপুজো, দোলযাত্রা, শিবরাত্রি উরুষ প্রভৃতি উপলক্ষে চিরাচরিত মেলা বসে টাঙন-তীরের অনেক জনপদে। হবিবপুর, কেন্দপুকুর, জগদলা, বুলবুলচণ্ডী, সাহাপুর, কাটিকান্দর, গোবিন্দপুর, আলাল, আমলিডাঙা, বলরামপুর, বামনগোলা, আহোড়া, আলমপুর, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি এলাকায় ধর্মীয় মেলা ও উৎসবের প্রাচুর্য। বামনগোলার শিবডাঙির শিবমন্দিরে প্রতিবছর

ভাদ্রপূর্ণিমা থেকে সপ্তাহ ব্যাপী বিরাট মেলা বসে। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শিবমন্দিরে পুজো দিতে বিহার ও ঝাড়খন্ড থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

বানপুরের ঝাপড়িকালীমেলা বসে ফি-বছর রামনবমী তিথিতে। বৈশাখের শনি ও মঙ্গলবারে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষেরা মায়ের পুজো দিতে আসেন। এ উপলক্ষে সেখানে জনচাঞ্চল্য থাকে। হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীতে কালীপুজো উপলক্ষে দু-সপ্তাহ ধরে মেলা চলে। বরিন্দে সর্বাধিক লোকের সমাগম হয় গাজোলের দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর মেলাতে। আদিবাসীদের সমাগমে এই মেলা দুটি পৃথকমাত্রা ধারণ করে। হোলির পরের দিন গাজোলের আমলিডাঙার মেলা ও চৈত্র পূর্ণিমায় হবিবপুরের সজনার মেলা শুধুই আদিবাসীকেন্দ্রিক।

উরুষ উপলক্ষে গাজোলের পাণ্ডুয়ায় দু-সপ্তাহ ধরে মেলা চলে। রাজ্যের নানা প্রান্তর তো বটেই, ভিন রাজ্যগুলি থেকেও প্রচুর ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই মেলায় যোগ দেন। হিজরি সনের রজব মাসের ২২ তারিখ থেকে পাণ্ডুয়ার বড় দরগাকে ঘিরে এই মেলা বসে।

গাজোলের ধাওয়েল গ্রামে মাঘীপূর্ণিমায় শুরু হয় কংসব্রত মেলা। মেলার প্রথম দিন গ্রামের সবাই আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকেন। সন্ধ্যায় একটি যজ্ঞের আয়োজনে তাঁরা সমবেত হন। সেখানে কিছু শস্য একটি মাটির সরার মধ্যে রেখে যজ্ঞের আগুনে দিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেবছর ফলন কেমন হবে ও শস্যের বাজারে দাম কেমন মিলবে।

বরিন্দ এলাকায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে গম্ভীরা উপলক্ষে বিভিন্ন জনপদে মেলা বসে। গাজোলের ফতেপুর, হাতিন্দা, ধ্যামধেমা; হবিবপুরের বুড়িতলা, শ্রীকৃষ্ণপুর; বামনগোলার মালতী, বোদরা, শালালপুর, বিনতারা, মোহনপুর, গোয়ালজয়, চাঁদপুর, হরিশঙ্করপুরে গম্ভীরা মেলা আয়োজিত হয়।

শ্মশানকালীকে কেন্দ্র করে বামনগোলার গোবরাকুড়ি, হবিবপুরের মানিকোড়, গাজোলের কৃষ্ণপুর, শালুকা, পাইল প্রভৃতি এলাকায় ধর্মীয় মেলা বসে। এইসব মেলায় বাউল, কীর্তন, আলকাপ ও পঞ্চরস পরিবেশিত হয়। বাঁকড়-বাহাদুরপুরে হোলির পনেরো দিন পরে শ্মশানমেলা অনুষ্ঠিত হয়। হবিবপুরের নয় মাইলের ধারেন্দা ও বোদরায় জ্যৈষ্ঠ মাসে গাঞ্জুরা মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফি-বছর খোকসনে বুড়িমেলা, পার-হবিনগরে গঙ্গামেলা, তেঁতুলতলায় শিবমেলা, তিতপুরে তারাকালীমেলা বসে। গাজোলের তারাতলায় দুর্গাপুজোর পরে শুক্লা-চতুদর্শী থেকে তারাকালীপুজো উপলক্ষে দশদিন ধরে মেলা বসে। আর পাঁচটা মেলার মতোই বিভিন্ন সামগ্রী ও উপকণের সমাহার থাকলেও লোকগান ও আধুনিক গান এই মেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মাঘীপূর্ণিমার স্নান উপলক্ষে টাঙন-তীরবর্তী জনপদগুলি মেলার আকার ধারন করে। এখানকার কয়েকটি খাড়ি ও বড়জলা সেদিন গঙ্গার মর্যাদা পায়। বেশির ভাগ জায়গাতেই তিন দিন থেকে সাত দিন ধরে মেলা বসে।

আষাঢ়ে রথযাত্রার মেলা ও চৈত্রে চড়কমেলা বরিন্দ এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে। গাজোলের বোলবাড়ি, শালবোনা, কাটিকান্দর, হবিবপুরের আইহো, বামনগোলার নালাগোলা, পুরাতন মালদহের সাহাপুর প্রভৃতি এলাকায় চড়ক উপলক্ষে একদিনের জমজমাট মেলা বসে। চৈত্র সংক্রান্তির এই মেলায় গোধূলিতে উপস্থিত হয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে দেখতে পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরের জন্য প্রত্যাশা করতে থাকেন দর্শনার্থীরা। বারিন্দায় মহামায়াপুজো উপলক্ষে মেলা বসে। বরিন্দের সবচেয়ে বড় রাসমেলা বসে গাজোলে। রাসযাত্রা উপলক্ষে এত বড় মেলা মধ্যবঙ্গের আর কোথাও দেখা যায় না। দু-সপ্তাহ ধরে চলে এই মেলা। ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে এই মেলা আয়োজিত হলেও কীর্তন-বাউল-যাত্রার পাশাপাশি চটুল হিন্দি নাচ, লটারি, কান-ফাটানো মাইকের তাড়না জনজীবনকে বিব্রত করে তোলে।

মহরম, ইদ ও মিলাদ-উল-নবি উপলক্ষে গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর ও পুরাতন- মালদহের অনেক জায়গায় মেলা আয়োজিত হয়।

খ) সামাজিক মেলা :

সামাজিক মেলা ও উৎসব ধর্মীয় আচারের উপর ভর করে নয়, ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করার স্বার্থে সামাজিক মেলা ও উৎসবের আয়োজন। বামনগোলার মদনাবতীর কেরি মেলা, গাজোলে গাজোল উৎসব ও পুষ্পপ্রদর্শনী, হবিবপুরে সিধু-কানু-বিরসা-জিতু মেলা এই উৎসবস্রোতের তরণী।

১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি নীলকুঠির দায়িত্ব নিয়ে মদনাবতীতে আসেন।[১] সাড়ে পাঁচ বছর ধরে এখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে এই জনপদের মানুষকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর এই অবস্থানকে স্মরণ করে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি কেরি- মেলা আয়োজিত হয়। সাহিত্য ও কবিতা পাঠের আসর এই মেলার অন্যতম প্রাপ্তি।

বরিন্দের বৃহত্তম সামাজিক মেলা 'গাজোল উৎসব'। ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে পুষ্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই উৎসবের শুরু। ১৯৯৮ থেকে স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা রুদ্রবীণার পরিচালনায় ও গাজোল হর্টিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এই মেলায় সংযোজিত হয় শিশু উৎসব। ধীরে ধীরে এখন তা বিরাট আকার নিয়েছে। ৭৫টি বিভাগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব শুরু হয় জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে। তবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রারম্ভিক পর্বের সূচনা হয় তার এক সপ্তাহ আগেই। গাজোল ব্লক ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, গাজোল বি এস এ স্টেডিয়ামে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও গাজোল হাইস্কুল ময়দানে মূল অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় কেব্‌ল চ্যানেলের মাধ্যমে ঘরে বসেই অনেকে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

হবিবপুরে প্রয়াত আদিবাসী নেতা জিতু হেমরমের বংশধরেরা বাস করেন। ইংরেজদের সঙ্গে আদিনা মসজিদের একপ্রান্ত থেকে যুদ্ধ করেন জিতু। বন্দুকের নলের সঙ্গে তির-ধনুকের অসম লড়াইয়েও তিনি পারদর্শিতা দেখান।

সন্ধিপ্রস্তাব পেশ করে ইংরেজরা তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক জমিদারকে দিয়ে গুলিবিদ্ধ করান। এই ঘটনাকে স্মরণ করে হবিবপুরে প্রতি বছর সিধু-কানু-বিরসা-জিতু মেলা আয়োজিত হয়। এ উপলক্ষে আদিবাসীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

নববর্ষ, নবান্ন, বড়দিন প্রভৃতি উপলক্ষে এই এলাকার অনেক গ্রাম সামজিক উৎসবে সেজে ওঠে। রাজবংশী-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে নবান্ন একটি সামাজিক মিলনোৎসব।

গ) রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় মেলা ও উৎসব :

প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন, ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস প্রভৃতি উপলক্ষে বরিন্দের বিভিন্ন এলাকায় উৎসব-অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মূলত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এসব উৎসব একটা সর্বজনীন রূপ লাভ করে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন রক্তদান শিবির, চিকিৎসা পরিষেবা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজন করে। ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস ও ২ অক্টোবর গান্ধিজির জন্মদিন উপলক্ষে টাঙন-তীরের কয়েকটি সংস্থা ফল বিতরণ, সাফাই অভিযান, আলোচনা সভা প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

যে-উপলক্ষেই মেলা ও উৎসব আয়োজিত হোক না কেন টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের জনপদে একটা অতিরিক্ত আন্তরিকতার ছোঁয়া মেলে। যার

ফলে অভাব ও দৈন্য সত্ত্বেও এখানকার মানুষদের মন বছরের প্রতিটি দিনই উৎসবমুখর থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি — প্রদ্যোত ঘোষ, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-১২ পৃষ্ঠা-১০২